ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা

(খসড়া কার্যপত্র)

৫ সেপ্টেম্বর ২০১০

জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা*

প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে ... এবং প্রশাসনে সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১১

১. প্রেক্ষাপট

১.১ গণতন্ত্র, অংশগ্রহণ ও নির্বাচন

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের এমন একটি অঙ্গীকার রয়েছে যার ফলে বাংলাদেশে একটি কার্যকর অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা।[১] গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এমন একটি সরকার-ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া যাতে জনস্বার্থ ও জনমতের কার্যকর প্রতিফলন ঘটে, এবং রাষ্ট্রীয় ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়। একইসাথে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ায় গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জনগণের কাছেই সরকারকে জবাবদিহি করার প্রক্রিয়া ও কৌশল প্রণয়ন ও কার্যকর করা। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকার গঠন, নীতি নির্ধারণ, এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটানোর যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলতে শুধুমাত্র কার্যকর প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাকেই বোঝায় না, এটি একই সাথে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে নির্বাচকরা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের গৃহীত নীতিমালায় অবদান রাখতে পারে, সমালোচনার সুযোগ পায় ও প্রয়োজনে প্রতিবাদ করতে পারে।

গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অন্যতম প্রধান প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি হচ্ছে নির্বাচন, যা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই নির্বাচনকে অর্থবহ করতে নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের কার্যকর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গনে জনমতের প্রতিফলন, প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষতা, এবং জবাবদিহিতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের বিকল্প নেই। আর এর জন্য প্রয়োজন জনগণের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, নির্বাচনে প্রার্থীদের জনগণের মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যের পর্যাপ্ততা, এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা। নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার বদল হয়, যা জোর-জবরদস্তি করে বা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের বিপরীত। তবে এর জন্য নির্বাচন হতে হবে "শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ"[২]। একইসাথে নির্বাচন হতে হবে অর্থবহ, যার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নির্বাচনই গণতন্ত্র নয়। এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা করে মাত্র।

প্রশ্ন করা যায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বলতে কী বোঝায়? তা কি শুধু নির্বাচনে ভোট দেওয়া, নাকি সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ? শুধু নির্বাচনে ভোট দেওয়া হলে তা হবে কেবলমাত্র একদিনের জন্য, যেখানে ভোটাররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র একজনকে নির্বাচিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। অন্যদিকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের রয়েছে বিভিন্ন পর্যায় – কোন দল থেকে কে মনোনয়ন পাবে তা থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, ভোট দেওয়া এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা – এই সবই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই দেখা যায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জনগণের অংশগ্রহণ অতি প্রয়োজনীয়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটদাতাদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা তাত্ত্বিক দিক থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ বহু শর্তের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী নির্বাচন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এছাড়া রাজনৈতিক দলের ভেতরে গণতন্ত্র চর্চার ঘাটতি, ভোটদাতাদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, অন্ধ দলীয় আনুগত্য, প্রার্থী সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি ইত্যাদি অবাধ পছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একইভাবে রাজনীতিতে দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাব, সংঘাতময় রাজনৈতিক আচরণ ও বিশেষকরে নির্বাচনে হার না মানার মানসিকতা প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের পথে বড় বাধা।

---

* ২০১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ব্র্যাক ইন সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে কার্যপত্র হিসেবে উপস্থাপিত। কার্যপত্রটি প্রস্তুত করেছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র ফেলো শাহজাদা এম আকরাম, ফেলো সাধন কুমার দাস ও মনজুর-ই-খোদা, এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো রুমানা শারমিন ও নাহিদ শারমীন।

[১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১ অনুসারে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে ... এবং প্রশাসনে সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"।

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৮ (ঘ) (২)।

১.২ গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার ও জনগণের মধ্যে অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে রাজনৈতিক দল।[৩] এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য নয়, বরং জনগণকে সেবা দেওয়ার প্রতিযোগিতাই হয় প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকে। অপরদিকে জনগণের মতামত বিভিন্নমুখী থাকে বলে তাদের এই মতামতকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক অঙ্গন, সরকার পরিচালনা ও সরকারকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করায় এর প্রতিফলন ঘটাতে রাজনৈতিক দলগুলোই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তারা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক চাহিদা ও দাবিগুলো সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত ও সুবিন্যস্ত করে তোলে। এ থেকে বলা যায় গণতন্ত্র বিনির্মাণে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম জনগণের সম্পৃক্ততা বা রাজনৈতিক নিয়োগ (political recruitment), যেখানে একটি রাজনৈতিক দল কোনো ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সুযোগ তৈরি করে দেয়। দলের সদস্যপদ সংগ্রহ, দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধিত্বের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এক ধরনের রাজনৈতিক নিয়োগ। নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার জন্য রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের মনোনীত করে এবং তাদের পক্ষে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করে। দল কিভাবে নির্বাচনে তার প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবে বা কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবে তা দলের অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কোনো দল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বা কয়েকজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারে। এছাড়াও নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক দল। তবে কার্যকর গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য রাজনৈতিক দলের এই "নিয়োগ প্রক্রিয়ায়" গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করাই বাঞ্ছণীয়, যার অভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে জনগণের দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

১.৩ জন-প্রতিনিধি, সরকার ও ভোটার

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে জাতীয় সংসদ যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত এবং পরবর্তীতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। সংসদ সদস্যরা সংসদে ভোটারদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে জনগণ পাঁচ বছরের জন্য তাদের নির্বাচিত করে। অন্যদিকে প্রার্থীরাও তাদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনী প্রচারণা ও দলীয় ইশতেহারের মাধ্যমে এবং স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা ও দাবি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের কাছে ভোটারদের গুরুত্ব নির্বাচনের পর কিছুদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় বলে দেখা যায়। নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কাছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং ভোটারদের প্রত্যাশা থেকে নিজস্ব স্বার্থই বেশি গুরুত্ব পায়। দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচনের পর নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের ওপর জন-সাধারণের তথা ভোটারদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। একমাত্র পরবর্তী নির্বাচনেই তারা নতুন করে রায় ঘোষণা করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিদের ওপর নির্বাচকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ বলে ধরা হয়। নির্বাচনোত্তর পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে ভোটদাতাদের নির্দেশ অনুসারে নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সরকারি নীতি নির্ধারণে অনুসৃত নাও হতে পারে। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটারদের রায় অগ্রাহ্য করে কোনো কোনো দল কোয়ালিশন গঠনের মাধ্যমে নির্বাচনে যায় বা যৌথভাবে সরকার গঠন করে। এক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও কর্মসূচি থেকে বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নয়। এছাড়াও তত্ত্বগতভাবে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে ভোটদাতাদের কোনো ভূমিকা নেই। রাজনৈতিক দলই প্রার্থী মনোনয়ন এবং তাদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, দলীয় নেতৃত্ব এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে ভোটারদের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার পেছনে যেসব কারণ বিদ্যমান তার মধ্যে ভোটারদের প্রতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিক দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা বা পদ্ধতির অভাব বা দুর্বলতা অন্যতম। যথার্থ প্রতিনিধিত্বের সারমর্ম হচ্ছে আইনসভা জনসাধারণের দ্বারা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে, এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনসাধারণের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন। কিন্তু যেখানে নির্বাচনী রাজনীতি একটি মুনাফা-অর্জনকারী বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়, সেখানে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে সাধারণ জনগণের স্বার্থের চেয়ে অর্থ ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় পরিণত হবে তা কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয়।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দল থেকে যেসব প্রার্থীদের চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়, দেখা যায় তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থীর মনোনয়ন ছিল বিতর্কিত। এসব প্রার্থীর একটি বড় অংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফৌজদারি মামলা ছিল।[৪]

---

[৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫২ (১) অনুসারে, "বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে ... "রাজনৈতিক দল" বলিতে এমন একটি অধিসজ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোন নামে কার্য করেন এবং কোন রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসজ্ঘ হইতে প্রথক কোন অধিসজ্ঘ হিসেবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন"।

[৪] ২৯৯টি আসনের সব প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে *সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)* জানায় প্রার্থীদের প্রায় ২০.৯৪% এর বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা হয়েছে এবং ১৩.৭৪% এর বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা চলছে। ঐ সময় বিএনপি'র ৪৯% এবং

এদের অনেকের বিরুদ্ধে ছিল যুদ্ধাপরাধ, ঋণ খেলাপ ও বিল খেলাপের মত অভিযোগ।[৫] প্রার্থীদের একটি বড় অংশের পেশা ছিল ব্যবসা, যাদের রাজনীতি করার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আয়কর দেয় না বলে জানা যায়।[৬] একনিষ্ঠ দলীয় সমর্থক ছাড়া সাধারণ জনগণের পক্ষে এ ধরনের প্রার্থীদের ভোট দেওয়া কতটুকু সম্ভব তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রতিনিধি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়নের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ভূমিকা রাখার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

২. প্রার্থী মনোনয়ন: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় এই প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারতের কংগ্রেস ও বিজেপি প্রধান দুই দলই একই স্বার্থগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে দেখা যায় একক কোনো ব্যক্তি বা অভিন্ন স্বার্থের ব্যক্তিবর্গের সমষ্টির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। দেখা যায় প্রধান দুই দলেই নির্বাচনী প্রার্থী বাছাই দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে হয়ে থাকে।[৭] শ্রীলংকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামোতে নিচ থেকে ওপর পর্যায় পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান থাকলেও দেখা যায় প্রার্থী মনোনয়নে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, যেখানে প্রার্থীদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার চেয়ে আর্থিক সামর্থ্য, এবং পারিবারিক পরিচয় বেশি প্রাধান্য পায়। নেপালেও মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীদের অর্থের বিনিময়ে প্রার্থিতা কেনার ধারা লক্ষ করা যায়। ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে এভাবে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী হন।

দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রার্থী বাছাই করার উদাহরণ রয়েছে, তবে তা প্রধানত সংশ্লিষ্ট দলের তৃণমূল পর্যায় থেকে করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যের লিবারেল পার্টির জাতীয় নির্বাহী কমিটি'র অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে যুক্তরাজ্যে প্রার্থী অনুমোদন দেওয়া। মূলত যেসব এলাকায় এই দলের সহযোগী সংস্থা (affiliated association) আছে সেসব এলাকায় একাধিক প্রার্থী থাকলে ভোটের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করে এবং যেখানে সহযোগী সংস্থা নেই সেখানে জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে এর জাতীয় নির্বাহী কমিটি (প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচিত) পার্লামেন্ট প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীতিমালা তৈরি করে এবং তা অনুসরণ করে পার্লামেন্টের প্রার্থী নির্বাচন করে। এই কমিটি পার্লামেন্টে প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য পাঁচ থেকে নয় জন ব্যক্তি নিয়ে একটি 'লিস্ট কমিটি' গঠন করে। প্রাদেশিক কাঠামো থেকে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা লিস্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রার্থী মনোনয়নে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে। এখানে পার্টির তালিকাভুক্ত (রেজিস্টার্ড) ভোটার কর্তৃক প্রত্যক্ষ প্রাথমিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। সরকার এবং রাজনৈতিক দলের তত্ত্বাবধানে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

৩. রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের এখতিয়ারভুক্ত। প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রেই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কমিটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকল স্তরের জনগণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় একজন সাধারণ কর্মীর পর্যায়ক্রমে জাতীয় পর্যায়ের নেতা হওয়ার সুযোগ থাকে। দল থেকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থাও অনেকটা এরকম। প্রতিটি দলে সংসদীয় বোর্ড রয়েছে যার সদস্যরা স্থানীয় পর্যায়ের জেলা বা উপজেলা কমিটির সহায়তায় মনোনয়ন দেয়। প্রতিটি দল তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংসদীয় বোর্ড গঠন করে এবং এই বোর্ডের সদস্যদের ওপর সর্বোপরি দলের সভাপতির ওপর মনোনয়ন চূড়ান্ত করার পূর্ণ ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকে, যা অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক।

এই মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ধারণা 'নিগূঢ় গণতন্ত্রের' (deep democracy) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। নিগূঢ় গণতন্ত্রের লক্ষ্য ব্যক্তির ক্ষমতায়ন। প্রতিটি ব্যক্তি গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই ক্ষমতায়ন হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত। ব্যক্তিকে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে, হয় নেতা হিসেবে বা কর্মী হিসেবে। নিগূঢ় গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছোট বা বড় সব পর্যায়ে প্রতিটি কণ্ঠস্বর যাতে শোনা যায় তা নিশ্চিত করা। এর প্রধান দায়িত্ব তাদের যারা ছোট বা বড় দলীয় প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের ভূমিকা অর্জন করেন।[৮]

আওয়ামী লীগের ২৫% প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছিল। তাদের মধ্যে কমপক্ষে ১০০ জনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা ছিল (আওয়ামী লীগের ২৪ জন ও বিএনপি'র ৩৪ জন)। ৪৮ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা চলমান বা দুর্নীতির দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ছিল (**সূত্র:** *ডেইলি স্টার*, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮)।

[৫] বাংলাদেশ ব্যাংকের (৩ ডিসেম্বর ২০০৮) ঋণ খেলাপিদের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী মোট ৮৮ প্রার্থীকে ঋণ খেলাপি হিসেবে উল্লেখ করা হয় (**সূত্র:** *প্রথম আলো*, ৪ ডিসেম্বর ২০০৮)। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা, গণহত্যা এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত ২১ জন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হন (**সূত্র:** *প্রথম আলো*, ৬ ডিসেম্বর ২০০৮)।

[৬] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী নির্বাচনে প্রার্থীদের ৩১.৬৬% কোনো আয়কর দেন না (**সূত্র:** *প্রথম আলো*, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮)।

[৭] কুলদীপ নায়ার, 'রাজনৈতিক দলের ভেতর গণতন্ত্র', *প্রথম আলো*, ৪ আগস্ট ২০১০।

[৮] হাসান ফেরদৌস, 'দিন বদলায়, বাংলাদেশ কেন বদলায় না', *প্রথম আলো*, ৩ নভেম্বর ২০০৯। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Patricia A. Wilson, 2004, 'Deep Democracy: The Inner Practice of Civic Engagement', *Fieldnotes: A Newsletter of the Shambhala Institute*, February 2004, Issue 3.

২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পরিচালিত একটি গবেষণায় সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠে আসে।[৯] এই গবেষণায় দেখা যায়, দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় জনমতের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য দলগুলোর কাছে জনগণের প্রত্যাশা রয়েছে। তাদের মতে মনোনয়ন প্রক্রিয়াটি তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে যাওয়া উচিত। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ নিজ এলাকার বা সংসদীয় আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে অবগত থাকেন। তাই তাদের মতামত নেওয়া উচিত। যে কোনো দলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলো নিজ উদ্যোগে জনমত যাচাই করে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং তা দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সংসদীয় বোর্ডের কাছে পাঠাতে পারে।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি-পরবর্তী সরকার সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক পদ্ধতি সংস্কার এবং নির্বাচনকে অর্থের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়। এসব সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় নেতা-কর্মীদের জড়িত করার উদ্যোগ। এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২' এ উল্লেখযোগ্য সংশোধন[১০] করে এবং এই সংশোধনের আলোকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার জন্য নতুন বিধি প্রণয়ন করে।[১১] সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের দলীয় শাখার সুপারিশক্রমে প্রার্থী মনোনয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়।[১২] এই প্রেক্ষিতে যেহেতু রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায় থেকে পাঠানো তালিকা থেকেই প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া, সেহেতু জনগণ আশা করে দলগুলো তাদের নিজেদের গঠনতন্ত্র অনুসরণ করলেই তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দলগুলো মনোনয়ন দেবে। এর ফলে প্রার্থী মনোনয়নে তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় সদস্যদের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে।[১৩]

৪. কার্যপত্রের যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থায়ী ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার জন্য স্থানীয় মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি বাংলাদেশে একটি নতুন ধারণা। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে এই ধারণার প্রয়োগ কতটুকু সম্ভব, এটি নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা কী, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এর কতটুকু কার্যকরতা প্রত্যাশা করা যায়, সেক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে জাতীয় নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই কার্যপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ জনগণ ও তৃণমূল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মতামত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা, বিদ্যমান মনোনয়ন প্রক্রিয়া আরও অংশগ্রহণমূলক করার সম্ভাবনা ও পদ্ধতি পর্যালোচনা করা, এবং তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে আরও কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রস্তাব করা।

৫. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এই কার্যপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের মতামত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যের অঞ্চলভিত্তিক বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য ধারণের লক্ষ্যে সারা দেশে সাতটি বিভাগের আটটি জেলা (সিলেট, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা ও ঝালকাঠি) এবং একটি উপজেলা (মধুপুর) অর্থাৎ মোট নয়টি স্থানে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালা ২০১০ সালের এপ্রিল থেকে মে – এই দুই মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

নয়টি কর্মশালার মোট ৬৩০ জন অংশগ্রহণকারী অর্থাৎ প্রতিটিতে গড়ে ৭০ জন করে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা, সাধারণ কর্মী ও সমর্থক, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিক এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকলে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। প্রতিটি কর্মশালার শুরুতে কার্যপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পর একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জরিপ পরিচালনা করা হয়।

---

[৯] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৪। এই গবেষণায় সারাদেশে ৩২টি সংসদীয় এলাকায় ৩,২০০ ভোটার, ১৩টি এলাকায় ২৪টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও ১৩টি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী, এবং ৫২ জন মুখ্য তথ্যদাতাদের নিয়ে মোট ৪,৪৩৩ জনের সাথে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

[১০] ২০০৮ এর ১২ নভেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত এবং পরবর্তীতে নবম সংসদে ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯* শীর্ষক আইনে পরিণত।

[১১] *রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮*।

[১২] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯* এর ধারা ৯০ খ (১)(খ)(ঈ) অনুযায়ী "... নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে নিম্নের সুস্পষ্ট বিধান থাকিবে যে ... সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানা ও জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর প্যানেল তৈরি করিবে এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড উক্ত প্যানেল হইতে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবার"।

[১৩] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্য বিষয়ক নাগরিক প্রত্যাশার সনদ*, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭।

পরবর্তীতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিষয়ভিত্তিক দলগত আলোচনা এবং মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সকলের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক পরিচিতি

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৬% এর বয়স ৩৬-৪৫ বছর এবং ২৫% এর বয়স ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে স্নাতক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৩২% এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৩০% উত্তরদাতা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ১: অংশগ্রহণকারীদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

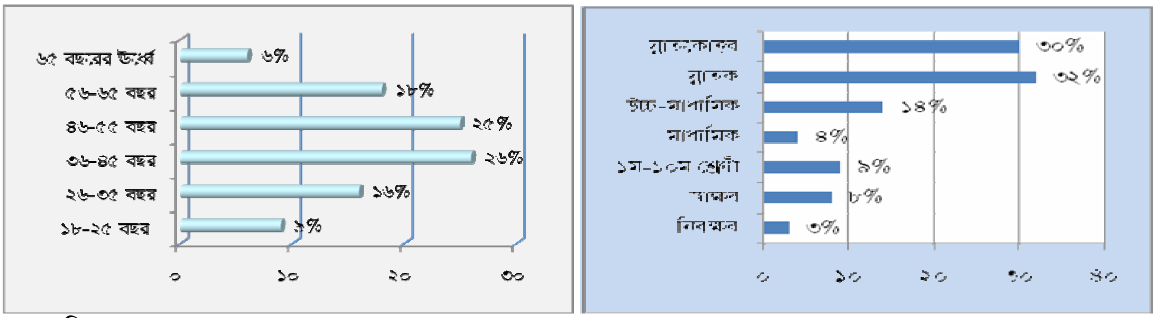

সূত্র: জরিপ ২০১০।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের উপস্থিতির হার যথাক্রমে ২১% ও ৭৯%। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২২% এর পেশা ব্যবসা। এছাড়া অন্যান্য পেশার মধ্যে শিক্ষক (১৬%), নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী (মোট ১৫%) এবং সরকারি চাকরিজীবী (১৩%) উল্লেখযোগ্য।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪% এর মাসিক আয় পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে। এছাড়া ২১% অংশগ্রহণকারীর মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকার নিচে, এবং ১৯% অংশগ্রহণকারীর মাসিক আয় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা।

চিত্র ২: অংশগ্রহণকারীদের পেশা ও মাসিক আয়

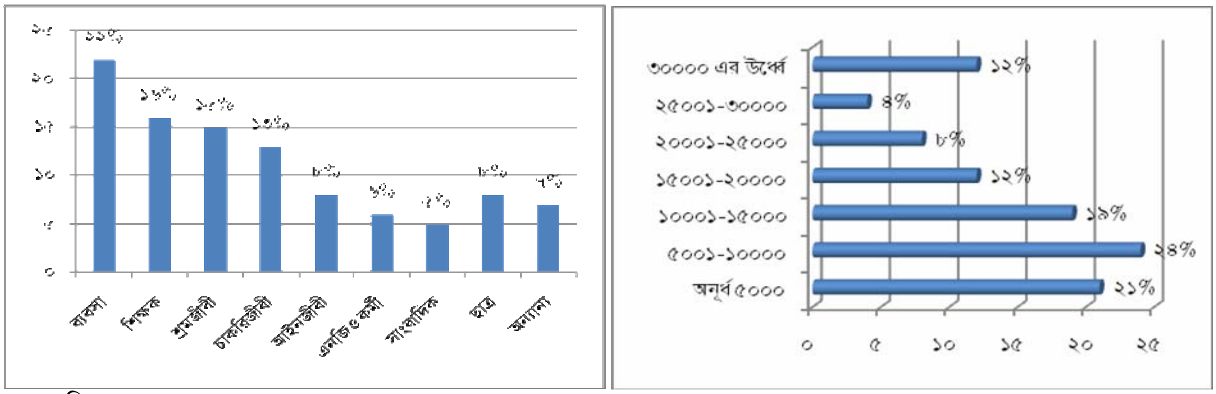

সূত্র: জরিপ ২০১০।

৬. নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণ: বর্তমান অবস্থা

নিচে বর্তমান কার্যপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মশালায় স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত জরিপ ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৬.১ বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: আওয়ামী লীগের সর্বশেষ সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুসারে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদসহ জাতীয় পর্যায়ে সকল নির্বাচনে সংগঠনের পক্ষ হতে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) বোর্ড গঠন করার কথা। আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, এবং জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা – এই তিনজন পদাধিকার বলে এই বোর্ডের সদস্য। অবশিষ্ট আট জন সদস্য আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য হতে কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পদাধিকার বলে তিনজন সদস্যের মধ্যে একই ব্যক্তি একাধিক পদের অধিকারী হলে বোর্ডের একটি সদস্যপদ শূন্য বিবেচিত হয়। এই শূন্যপদে কাউন্সিল অতিরিক্ত একজন সদস্য নির্বাচন করবে।

আওয়ামী লীগের সভাপতি পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সংসদীয় বোর্ডের সম্পাদক হয়ে থাকেন। নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে সংসদীয় বোর্ড। নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন

প্রার্থী হয়, তারা এই বোর্ডের কাছে মনোনয়ন প্রার্থনা করে যে দরখাস্ত করে, তার অনুরূপ এক কপি দরখাস্ত জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের কাছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে লিখিত রশিদ নিয়ে বা পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন করে পাঠাতে হয়।

উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ সংশিষ্ট নির্বাচনী সংসদীয় আসনভিত্তিক মনোনয়ন প্রার্থীদের গুণাগুণ, জনপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে তাদের সুপারিশ সংবলিত একটি প্রার্থী প্যানেল নিজ নিজ সাংগঠনিক কমিটির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড বরাবর পাঠাবে। সংসদীয় বোর্ড এই প্যানেলের মধ্য থেকে একজনের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি): জাতীয় সংসদ নির্বাচন বা অন্য যে কোনো নির্বাচনের জন্য দলের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য দলের একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড রয়েছে। ১৯ সদস্যবিশিষ্ট দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটিই দলের পার্লামেন্টারি বোর্ড। তবে যে জেলার প্রার্থী মনোনয়নের জন্য পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভা আহবান করা হয় সেই জেলার সভাপতি, প্রথম তিনজন সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এই সভায় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য বলে গণ্য করা হয়। তবে কোনো সদস্য নিজেই নির্বাচনে প্রার্থী হলে তার নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী বিবেচনার সময় বোর্ডের সভায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। দলের চেয়ারম্যান হচ্ছেন বোর্ডের সভাপতি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিংবা যে কোনো নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব পার্লামেন্টারি বোর্ড পালন করে এবং এ ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। তবে পার্লামেন্টারি বোর্ড সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা অথবা জেলা কমিটি (যদি থাকে) কর্তৃক প্রণীত প্রার্থী প্যানেল থেকে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনীত করে।

জাতীয় পার্টি: জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য পার্টির পক্ষ হইতে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য সাত জন সদস্য সমন্বয়ে একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়। পার্টির চেয়ারম্যান এবং মহাসচিব পদাধিকার বলে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডের বাকি পাঁচ জন সদস্য চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। সংসদ নির্বাচনের জন্য পার্টির প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব পার্লামেন্টারি বোর্ড পালন করে এবং এ ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে পার্লামেন্টারি বোর্ড একমত হতে ব্যর্থ হলে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। বাধ্য থাকবে না

৬.২ নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়া: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাস্তবতা

সর্বশেষ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামত গ্রহণের দাবি করা হলেও বাস্তবতা ছিল কিছুটা ভিন্ন। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মতে, দুই প্রধান দলই নির্বাচনের আগে সময়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের মতামত গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়।

আওয়ামী লীগ তাদের জেলা, উপজেলা/ থানা এবং ইউনিয়ন/ পৌর ওয়ার্ড কার্যনির্বাহী সংসদের কাছ থেকে আসনভিত্তিক মনোনয়ন প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা যাচাই করে তিন জনের একটি প্যানেল দলের সংসদীয় বোর্ডের কাছে পাঠানোর জন্য আহ্বান করে। বেশ কিছু আসনে এই তৃণমূলের পাঠানো প্যানেল থেকে প্রার্থী মনোনীত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মনোনয়নে তৃণমূল পর্যায়ের মতামতের প্রতিফলন দেখা যায়নি। কয়েকটি আসনে তৃণমূল হতে কোনও প্যানেলের সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়নি বলে জানা যায়।

অন্যদিকে বিএনপি'র পক্ষ থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে সাতটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। এই দলগুলো স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের দলীয় ফোরাম ও অঙ্গ-সংগঠন এবং তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা তৈরি করে। পরবর্তীতে সংসদীয় বোর্ডে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মনোনয়ন তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মনোনয়নে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মতামতের প্রতিফলন দেখা যায়নি। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের ভোট বা মতামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্যানেল তৈরির নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়।

এই কার্যপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা ও জরিপের ভিত্তিতে বিদ্যমান নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় যে ধারা লক্ষ করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হল।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ	
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়	৩৭%
এদের মধ্যে	
▪ রাজনৈতিক দলের সাথে নিবন্ধিত	৮৩%
▪ কমিটি গঠন বা মনোনয়নে অংশগ্রহণ	৭৪%
▪ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে অংশগ্রহণ	৫২%

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, ৬৩% অংশগ্রহণকারী রাজনীতিতে সক্রিয় নয়। অন্যদিকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৭% রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, অর্থাৎ তারা নিজের সমর্থিত রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, যেমন মিছিল-মিটিং ও অন্যান্য কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। যারা রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত তাদের ৮৩% মূলধারার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে নিবন্ধিত এবং ৭৪% রাজনৈতিক দলে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটি গঠন

এবং প্রতিনিধি মনোনয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে ৫২% সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে বলে উল্লেখ করে।

অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মধ্যে যারা নবম জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে ভূমিকা রেখেছে, তাদের মধ্যে ৪১% প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দলীয় সম্মেলনে ভোট প্রদান করেছে, এবং দলীয় জরিপে অংশগ্রহণ করেছে ৩৪%। এছাড়া নেতা-কর্মীদের মধ্যে ৫৪% দলীয় ফোরামে প্রার্থী নির্বাচন সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ, ৪৪% সমর্থিত মনোনয়ন প্রত্যাশীর পক্ষে জনসংযোগ ও প্রচারণায় অংশগ্রহণ, এবং ১৫% নেতা-কর্মী নিজের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তদবির (লবিইং) করেছে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের এক-চতুর্থাংশ (২৪%) প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে।[১৪]

প্রার্থী মনোনয়নে অংশগ্রহণের ধরন

প্রত্যক্ষভাবে

- **দলীয় সম্মেলনে ভোট প্রদান ৪১%**
- **দলীয় জরিপে অংশগ্রহণ ৩৪%**

পরোক্ষভাবে

- **দলীয় ফোরামে আলোচনা ৫৪%**
- **জনসংযোগ ও প্রচারণা ৪৪%**
- **কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লবিং ১৫%**

প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় আরও বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ না করার পেছনে বিষয়ভিত্তিক দলীয় পর্যালোচনা এবং মুক্ত আলোচনায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা নিচের কারণগুলো উল্লেখ করে।

৬.২.১ চূড়ান্ত মনোনয়নে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

অংশগ্রহণকারীদের মতে সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া ছিল মূলত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত-নির্ভর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল না। নেতা-কর্মীদের অনেকেই সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা তৈরিতে দলীয় জরিপ বা দলীয় সম্মেলনে ভোট গ্রহণের কথা জানতো না বলে জানায়। অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করে উভয় জোট থেকেই তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সুপারিশ উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৬.২.২ মনোনয়ন প্রাপ্তিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লবিইং

অংশগ্রহণকারীদের মতে চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রাপ্তিতে শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত পছন্দ ও বিশ্বস্ততা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র অনুসারেই মনোনয়ন চূড়ান্ত করার ক্ষমতা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হাতে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে সংসদীয় বোর্ডের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শীর্ষ নেতৃত্বের প্রভাব থাকে।

একইভাবে শীর্ষ নেতৃত্বের বিশ্বস্ত ও কেন্দ্রীয় প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দও মনোনয়ন চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকেন। ফলে মনোনয়ন প্রত্যাশীরাও শীর্ষ নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, স্বজন-প্রীতি ও লবিংকে স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণের মতামতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৬.২.৩ 'পরিবারতন্ত্র' এর প্রভাব

অংশগ্রহণকারীদের মতে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় 'পরিবারতন্ত্র' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। শীর্ষ নেতৃত্ব হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের মনোনয়নে পরিবারতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রেও পরিবারতন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান।

৬.২.৪ মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থের প্রভাব

বিষয়ভিত্তিক দলীয় পর্যালোচনা ও মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সকলেই নির্বাচনী মনোনয়নে অবৈধ অর্থের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে। তারা অভিযোগ করে, অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থীর রাজনৈতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তে তার আর্থিক ক্ষমতাকে, অর্থাৎ মনোনীত হওয়ার পর নির্বাচনে ভোট কেনা এবং দলের নির্বাচনী তহবিলে অনুদান দেওয়ার সামর্থ্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনেকে মনোনয়ন বাণিজ্য অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে দলের স্থানীয় ও ত্যাগী নেতাকে বঞ্চিত করে বহিরাগত বা রাজনীতিতে নবাগত কোনও পেশাজীবী, ব্যবসায়ী বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলাকে মনোনয়ন দেওয়ার অভিযোগ করেন। কিছু ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে এমনকি তৃণমূল পর্যায়ের কাউন্সিলরদের মতামত বা সুপারিশ গ্রহণের জন্য অবৈধ প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের মতে এভাবেই মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তে অর্থের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধির প্রবণতা বেশি ভূমিকা রেখেছে।

৬.২.৫ মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় পেশী শক্তির প্রভাব

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতে নির্বাচনী মনোনয়নে অনেক ক্ষেত্রেই মনোনয়ন প্রত্যাশীর পেশী শক্তি, শক্তিশালী সমর্থক বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। নির্বাচনে বল প্রয়োগ ও হুমকির মাধ্যমে কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠীর ভোট আদায় বা তাদের ভোট প্রদানে বিরত রাখার সামর্থ্য মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে

---

[১৪] অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিচালিত জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী।

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থী মনোনয়নে আর্থিকভাবে প্রভাবশালী ও পেশী শক্তির অধিকারী, সর্বোপরি যেকোনো ভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা যার সবচেয়ে বেশি তাকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়। এই সকল বিবেচনায় অনেক সময় স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় নেতাদেরকেও মনোনয়ন বঞ্চিত করা হয়।

৬.৩ প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়নে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণ

সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে যেসব প্রার্থীদের মনোনয়ন নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও নাগরিক সমাজের সন্তুষ্ট ছিল তার কারণ যোগ্য প্রার্থী হিসেবে এসব প্রার্থীর পরিচিতি, প্রার্থীর সততা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে প্রার্থীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীর স্থায়ী বসবাস সন্তুষ্টির পেছনের অন্যতম কারণ ছিল।

চিত্র ৩: প্রার্থী মনোনয়নে সন্তুষ্টির কারণ

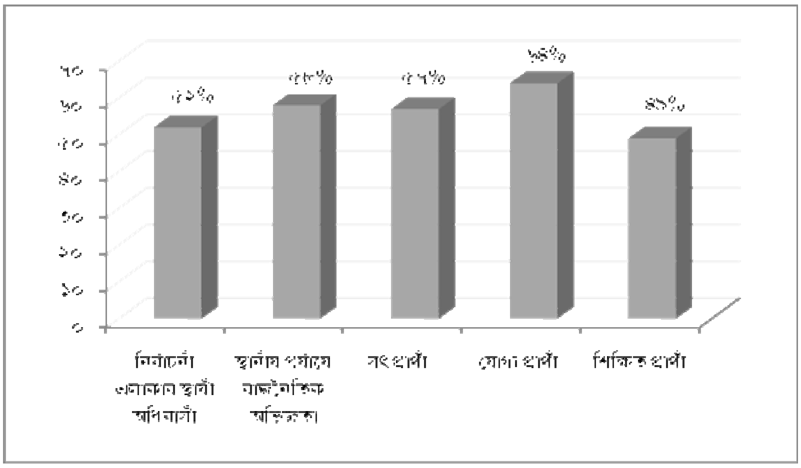

অন্যদিকে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা যেসব প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার প্রধান কারণ ছিল তৃণমূলের মতামতকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত মনোনয়ন দান। এছাড়া ব্যক্তিগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক ভাবমূর্তি ও প্রভাবের কারণে মনোনয়ন প্রাপ্তি, অর্থের প্রভাব এবং পেশী শক্তির প্রভাবে মনোনয়ন প্রাপ্তির প্রতি তাদের অসন্তোষ জানায়।

চিত্র ৪: প্রার্থী মনোনয়নে অসন্তুষ্টির কারণ

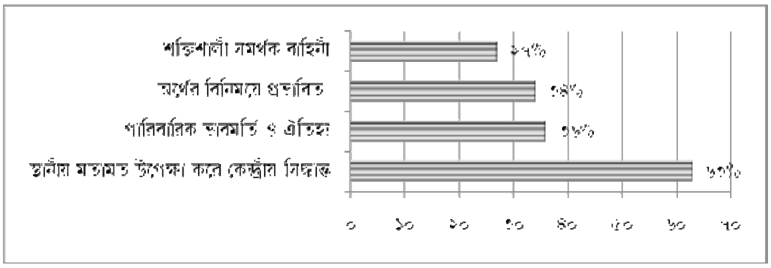

৭. নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতার কারণ

বর্তমান কার্যপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতে রাজনৈতিক দলের সাথে সাধারণ জনগণের সেতুবন্ধন না থাকার কারণেই নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নিচে জাতীয় নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের কার্যকর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা সমূহ আলোচনা করা হল।

৭.১ রাজনৈতিক দলগুলোতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার অভাব

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র চর্চার ঘাটতি রয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা দলের সাংগঠনিক কাঠামোর স্তরগুলোতে বিভিন্ন কমিটির অকার্যকরতার উল্লেখ করে। তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতে রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র বা সংবিধানে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এসব কমিটি নিয়মিত গঠিত হয় না। দলীয় কোন্দলের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি বা *অ্যাড হক* কমিটি দ্বারা কার্যক্রম চালানো হয়। এমনকি নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিটিগুলোর সভাও অনুষ্ঠিত হয় না। এসব কমিটি গঠনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও অংশগ্রহণমূলক ও কার্যকর গণতন্ত্র চর্চার অভাব থাকে। তবে তাদের মতে অপেক্ষাকৃত ছোট দলগুলোতে এই চর্চা বিদ্যমান।

গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যেকটিতে ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী কাউন্সিল হওয়ার আগে দলের সকল পর্যায়ে কমিটি গঠন হওয়ার কথা থাকলেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলেই কাউন্সিল অনুষ্ঠানের প্রায় এক বছর পরও সবগুলো

কমিটি গঠন সম্ভব হয়নি। এছাড়াও দেখা যায় আইন অনুযায়ী দলের নির্বাচনী মনোনয়নের ৩৩ শতাংশ নারীদের জন্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এটি গত নির্বাচনে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

সারণি ১: প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল সংক্রান্ত তথ্য

	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি
প্রতিষ্ঠার সাল	২৩ জুন ১৯৪৯	১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮	১ জানুয়ারি ১৯৮৬
সর্বশেষ কাউন্সিল	২০তম কাউন্সিল ২৩ জুলাই ২০০৯	৫ম কাউন্সিল ৮ ডিসেম্বর ২০০৯	৭ম কাউন্সিল ২৪ জুলাই ২০০৯
দ্বিতীয় সর্বশেষ কাউন্সিল	২৬ ডিসেম্বর ২০০২	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩	২০০৫
সর্বশেষ দুইটি কাউন্সিলের মধ্যে ব্যবধান	৭ বছর	১৬ বছর	৫ বছর

৭.২ শীর্ষ নেতৃত্বের একচ্ছত্র ক্ষমতা

তৃণমূলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সব পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে শীর্ষ নেতৃত্বের অবাধ, নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতাকে দায়ী করে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় গঠনতন্ত্রের মাধ্যমেই শীর্ষ নেতৃত্বের একচ্ছত্র ক্ষমতা তথা যেকোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া আছে। এছাড়া একই ব্যক্তির একাধিক পদে দায়িত্ব পালন এবং একই পদে দীর্ঘদিন যাবত দায়িত্ব পালন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠ বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

৭.৩ পদ্ধতিগতভাবে অংশগ্রহণমূলক সুযোগের অভাব

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করে যে বর্তমানে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ, এমনকি তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য পদ্ধতিগত কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। সংশোধিত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আইনে' রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে নির্বাচনী মনোনয়নে তৃণমূল পর্যায়ের মতামত বা সুপারিশ নেওয়ার কথা বলা থাকলেও তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকির ব্যবস্থা রাখা হয়নি, অথবা তা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ নেই। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে এই ক্ষেত্রে জনগণের মতামত গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা লক্ষ করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বশেষ সংশোধিত গঠনতন্ত্রে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামত বা সুপারিশ গ্রহণের উল্লেখ থাকলেও কোন প্রক্রিয়ায় তা করা হবে (যেমন উন্মুক্ত বা গোপন ব্যালট, জরিপ) তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

৭.৪ নির্বাচন-কেন্দ্রিক রাজনীতি

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতে বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্বাচন-কেন্দ্রিক। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মানসিকতা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে। নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে প্রার্থীদের জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এই সকল প্রার্থীকে আর জনগণের কাছাকাছি পাওয়া যায় না। অংশগ্রহণকারীরা আরও অভিযোগ করে, অনেক ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না, বা অনেকের মাঠ পর্যায়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও থাকে না। শুধুমাত্র নির্বাচন-পূর্ব রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তারা এলাকায় যাওয়া-আসা করতেন। ফলে সাধারণ জনগণের পক্ষে তাদেরকে কাছ থেকে দেখার বা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জানার সুযোগ হয় না। নির্বাচনে কোনোভাবে হার না মানার মানসিকতা রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের সেবা হতে রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত করছে। একই কারণে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কালো টাকা ও পেশী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.৫ নির্বাচন-পরবর্তী কার্যকর জবাবদিহিতার অভাব

বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে জয়ী হওয়ার নির্ধারিত মেয়াদ শেষে আরেকটি নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচক বা জনগণের কাছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকর জবাবদিহিতার কোনো পদ্ধতি বা সুযোগ নেই। সুতরাং নির্বাচিত প্রার্থীরাও শুধুমাত্র নির্বাচনে জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সাধারণ জনগণের ভূমিকা পালনের সুযোগ সীমিত। শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন ভোট দেওয়ার মধ্যেই সাধারণ জনগণের গণতান্ত্রিক চর্চা সীমাবদ্ধ। এতে গণতন্ত্রের যে মূল লক্ষ্য – সকল পর্যায়ে সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব – তা ব্যাহত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতে সংসদ সদস্যরা নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন না করলে এবং সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব না করলে, অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদ সদস্য প্রত্যাহারের (Recall) মাধ্যমে জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৭.৬ তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতার অভাব

সামগ্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যকর অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণের সচেতনতার অভাব অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। মূলত স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের অসচেতনতার কারণে নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীর যোগ্যতা অপেক্ষা প্রার্থীর দলীয় পরিচয় বা মার্কা দেখে ভোট দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা প্রার্থীর মার্কা দেখে ভোট দিয়ে থাকে। একই কারণে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবারতন্ত্র, কালো

টাকা ও পেশী শক্তির অবৈধ প্রভাবে প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও তৃণমূলের মতামতকে উপেক্ষা করা হয়। প্রার্থী মনোনয়নে বা নির্বাচনে ভোট কেনার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন না থাকার কারণেই স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণ নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণে ব্যর্থ হয়।

৭.৭ প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি

স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনায় জানা যায়, মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থী সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নাম ও দলীয় পরিচয় অর্থাৎ মার্কা ছাড়া অন্য কোনো তথ্য জানতো না। সাধারণ জনগণের কিছু অংশের প্রার্থীদের শিক্ষা, পেশা ও আয় সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন আয় ও আয়ের উৎস, খেলাপি ঋণের পরিমাণ, প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। প্রার্থীর মনোনয়ন পত্রের সাথে হলফনামায় বাধ্যতামূলকভাবে আটটি তথ্য[১৫] প্রকাশ সংক্রান্ত আইন সর্ম্পকেও তারা জানতো না।

অংশগ্রহণকারীরা নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সাধারণ জনগণ কর্তৃক না জানার কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের উদ্যোগের ঘাটতির কথা উল্লেখ করে। মনোনয়ন প্রত্যাশীদের তথ্য প্রচারে নির্বাচন কমিশন বা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত উদ্যোগ ছিল না। প্রার্থীর নিজ উদ্যোগে এ সংক্রান্ত যে সকল পোস্টারিং হয় তা ছিল মূলত শহর-কেন্দ্রিক। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের কাছে এসব তথ্য পৌঁছায়নি।

৮. উপসংহার ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণের ধারণা অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও দক্ষিণ এশীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয় এবং নিবন্ধনের অন্যতম শর্ত হিসেবে এটি বাধ্যতামূলক করা হয়। নিবন্ধিত দলগুলোও তাদের দলীয় গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিয়ে আসে। সর্বশেষ নির্বাচনের বিভিন্ন দলের মনোনয়নে স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তবে এর পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে তৃণমূলের কার্যকর অংশগ্রহণ ছিল না।

সার্বিকভাবে বলা যায় স্থানীয় অংশগ্রহণমূলক এই প্রক্রিয়া এখনও সূচনা পর্যায়ে রয়েছে যা ধারাবাহিক ও নিয়মিতভাবে চর্চা করলে আরও কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ রয়েছে। এর জন্য কয়েকটি সুপারিশ প্রস্তাব করা হল।

৮.১ মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

জাতীয় নির্বাচনের চূড়ান্ত মনোনয়নে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আসন অনুযায়ী সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রার্থীদের প্যানেল তৈরিতে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সরাসরি বা গোপন ব্যালটে ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। পরবর্তীতে তৃণমূলের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ের সুপারিশকৃত প্যানেল থেকেই চূড়ান্ত মনোনয়ন দিতে হবে। যদি স্থানীয় পর্যায়ের সুপারিশকৃত প্যানেল থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তার কারণ পরবর্তীতে দলীয় ফোরামে প্রকাশ করতে হবে। মনোনয়ন প্রত্যাশীদের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা যাচাই-বাছাইয়ের সুবিধার্থে তৃণমূল পর্যায়ে ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থী সম্পর্কে দলীয় সমর্থক, নেতা-কর্মী ও স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতামত জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.২ দলীয় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা বৃদ্ধি

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী মনোনয়নে তথা সামগ্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। এর জন্য দলের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রতিটি স্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। সকলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দলের সর্বনিম্ন হতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ প্রতিটি স্তরে নেতৃত্বের বিকাশ প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা ও ব্যবস্থাপনার বিকাশে নিয়মিত কমিটি গঠন এবং কমিটিগুলোর সক্রিয় ভূমিকা পালন জরুরি। দলের অভ্যন্তরে চিন্তার স্বাধীনতা তথা মত প্রকাশে স্বাধীনতার চর্চা বাড়াতে হবে এবং ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সচেতন করার লক্ষ্যে নিয়মিত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী কোনো দলের মনোনয়নের ৩৩ শতাংশ নারীদের দিতে হলে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোতেও নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

[১৫] এই আট ধরনের তথ্যের মধ্যে রয়েছে (১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (২) বর্তমানে প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা, (৩) অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল, (৪) প্রার্থীর পেশা, (৫) প্রার্থীর আয়ের উৎস(সমূহ), (৬) অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে তার ভূমিকা, (৭) প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা, এবং (৮) ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং এমন কোম্পানি থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা যে কোম্পানির তিনি সভাপতি, বা নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক।

৮.৩ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর ও জনকল্যাণকর গণতন্ত্রের বিকাশে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অতিমাত্রায় কেন্দ্র-নির্ভরতা কমাতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কমাতে হবে। একইসাথে সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব নির্বাচনে পরিবারতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত যোগ্যতার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় অধিকতর প্রয়াসী হতে হবে। দলের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব নির্বাচন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের বা তৃণমূল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৪ নির্বাচনী আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা

গণপ্রতিনিধিত্ব আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নিয়ম কানুনের যেসব আইনি সংস্কার করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দলগুলো স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে তার দিক-নির্দেশনা দিতে হবে। এছাড়াও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর কার্যকর যাচাই-বাছাই, নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থী সম্পর্কিত আট তথ্য প্রকাশ, এবং নির্বাচনী আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অর্থের প্রভাব দূর করতে নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮.৫ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ

নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন। সাধারণ জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন ও নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীদের বিভিন্ন তথ্য স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। যেমন প্রার্থীর তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তৈরি পোস্টার বা লিফলেটে বাধ্যতামূলকভাবে প্রার্থীর ছবিসহ আটটি তথ্য সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে এই তথ্য প্রচারের উদ্যোগ হিসেবে ব্যাপক গণ-সংযোগ, প্রার্থী পরিচিতি সভা, গ্রাম পর্যায়ে উঠান বৈঠক, তৃণমূল নেতা-কর্মী এবং এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে মতবিনিময় করতে হবে। 'জনগণের মুখোমুখি' শীর্ষক নাগরিক সভার মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম, পথ নাটক, ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রভৃতি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। এসব উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও তার সমর্থিত রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নেওয়া যেতে পারে।

৮.৬ গণ-মাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা পালন

নির্বাচনী আইন, মনোনয়ন প্রক্রিয়া এবং মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রচারে গণ-মাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে মনোনয়ন প্রার্থী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রচারে স্থানীয় গণ-মাধ্যম ও কমিউনিটি রেডিও'র ব্যবহার বাড়াতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদ-মাধ্যমগুলো নিরপেক্ষভাবে সব দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ওপর আট তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য প্রচার করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচনে মনোয়নের পূর্বে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ২০০৯' এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে তৃণমূলের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে ও তার চর্চা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সক্রিয় প্রচারণা চালাতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ

১. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ঢাকা।
২. নির্মলকান্তি ঘোষ ও পিতম ঘোষ, ২০০১, *রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, কলকাতা।
৩. বদিউল আলম মজুমদার, ২০০৯, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৪. Eric Bjourlund, 2004, *Beyond free and fair Elections: Monitoring Elections and Building Democracy,* John Hopkins University Press.
৫. Allan R. Ball, 1993, *Modern Government and Politics*, Macmillan.
৬. Robert Dahl, 2000, *On Democracy*, Yale University Press, New Haven, CT.
৭. Patricia A. Wilson, 2004, 'Deep Democracy: The Inner Practice of Civic Engagement', *Fieldnotes: A Newsletter of the Shambhala Institute*, February 2004, Issue 3.
৮. International Institute for Democracy & Electoral Assistance (IDEA) and Centre for Policy Alternatives, 2005, 'Sri Lanka, Country Report Based on Research and Dialogue with Political Parties', pg. 10. http://www.idea.int/parties/upload/SriLankaCountryReport.pdf
৯. http://www.medregion.mepi.state.gov/democracy_matters_political_parties_imperative.html (accessed on 24 February 2010).
১০. www.undp.org/governance/about.html (accessed on 24 February 2010).
১১. www.gsdrc.org (accessed on 24 February 2010).